ইউনিট

১১ আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য

ভূমিকা

বিশ্বের সবকিছু আইন বা নিয়মের অধীন। সবকিছুই নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এগুলো প্রাকৃতিক আইন। কিন্তু পৌরনীতিতে আইন বলতে কেবলমাত্র রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মকে বুঝায়। এগুলো মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই আইনগুলো রাষ্ট্র ও সমাজ তৈরি করে। তবুও প্রথা, ধর্ম, বিচারকের রায়, ন্যায়বোধ প্রভৃতি উৎস হতেও আইন জন্মলাভ করে। আইনের সব থেকে শক্তিশালী উৎস হল আইন পরিষদ ও জনমত। আইনের শাস্তিমূলক ক্ষমতার কারণে জনগণ আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদান করে। কিন্তু কেবলমাত্র ভয়ের কারণে জনগণ আইন মান্য করে না। সমাজের নৈতিকতার উপর আইন প্রতিষ্ঠিত এবং নিরপেক্ষ বলেই আইন স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য লাভ করে। অর্থাৎ আইন ও নৈতিকতা পরস্পর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রের ক্ষমতাও আইনের উপর নির্ভরশীল যদিও রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে। আইনের দ্বারাই রাষ্ট্র সুশৃঙ্খল জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলে। জনগণের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য রাষ্ট্রকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হয়। আইন ছাড়া স্বাধীনতা উপভোগ করা সম্ভব নয়। আইন আছে বলেই স্বাধীনতা আছে। আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর নির্ভরশীল। স্বাধীনতা আবার সাম্যের উপর নির্ভরশীল। লাস্কির মতে রাষ্ট্র যত বেশি সমতা বিধান করবে স্বাধীনতার উপভোগ তত বেশি নিশ্চিত হবে। সুতরাং স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান, এই নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। এই ইউনিটে স্বাধীনতা ও সাম্যের বিকাশ সাধনে আইনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ– ১ : আইনের সংজ্ঞা, অর্থ, বৈশিষ্ট্য, উৎস, শ্রেণিবিভাগ, আইন ও নৈতিকতা, আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক।

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- আইনের সংজ্ঞা ও অর্থ নিরূপণ করতে পারবেন।
- আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- আইনের উৎসগুলো বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- আইনের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১১.১.১ আইনের সংজ্ঞা ও অর্থ

আইনের ইংরেজি অর্থ খধি। এই শব্দটি টিউটোনিক ভাষার মূল শব্দ খধম হতে এসেছে। এর অর্থ স্থির, অপরিবর্তনীয় এবং সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ আইন এমন এক কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে যা রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের উপর সমভাবে প্রযোজ্য। আইনের সংজ্ঞা দিয়ে অস্টিন বলেন, "আইন হল সার্বভৌমের নির্দেশ।" অধ্যাপক হল্যান্ড বলেন, "মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত কতকগুলো সাধারণ নিয়মকে আইন বলে।" বিশ্লেষণপন্থীদের উপরিউক্ত ধারণা অনুযায়ী আইন বিশেষভাবে সৃষ্ট এবং এর পিছনে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা দ্বারা বলবৎকরণের ব্যবস্থা আছে বলেই আদেশ আইনে পরিণত হয়। আইনের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বা আইন

বিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয় একথা তারা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করেন। অপরপক্ষে ঐতিহাসিকগণ উৎসমূলকে অগ্রাধিকার দিয়ে বলেন আইন আদেশ আকারে রচিত হয় না বরং ক্রমাগত সমাজে অবস্থান ও আনুগত্যলাভের কারণেই আইন গড়ে উঠে। তবে একথা ঠিক যে আদেশ ও বিবর্তনের সংমিশ্রিত অবদানে রাষ্ট্রীয় আইন গড়ে উঠে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আইনের সংজ্ঞা দিয়ে উড্রো উইলসন বলেন যে, **"সামাজিক যে সকল সুপ্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাসের অংশ যা রাষ্ট্রকর্তৃক গৃহীত বিধিতে পরিণত হয়েছে, নিয়মিতভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং যার পশ্চাতে শাসকের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অনুমোদন রয়েছে, তাই আইন।"**

১১.১.২ আইনের বৈশিষ্ট্য

আইনের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে আইনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় :

১। সার্বজনীনতা– আইন সার্বজনীন ও সমভাবে প্রযোজ্য। সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর আইনের কর্তৃত্ব সমভাবে প্রতিষ্ঠিত।

২। আচরণ নিয়ন্ত্রক– আইন বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ কোন অপরাধ সংঘটিত হলে অপরাধীকে আইনের আওতাভুক্ত হতে হয়। আইন মোতাবেক বিচার করা হয় এবং শাস্তি দেওয়া হয়।

৩। অনুমোদিত ও স্বীকৃত– আইন সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত বিধি। কেবলমাত্র সমাজ ও রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত হলেই আইনের পেছনে শক্তিশালী মঞ্জুরী রচিত হয় এবং স্বভাবজাতভাবে বা কোন কোন সময়ে ভয়ে আইন আনুগত্য লাভ করে।

৪। অবশ্য পালনীয়– আইন অবশ্যই পালনীয়। সকলকেই আইন মেনে চলতে হয়। আইন আছে বলেই মানুষ অধিকার ভোগ করে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আইন কর্তৃপক্ষকে বা বিচারককে যে নিরপেক্ষতা দান করে তাই ন্যায় বিচারের ভিত্তি।

১১.১.৩ আইনের উৎস

অধ্যাপক হল্যান্ড আইনের ছয়টি উৎসের কথা বলেছেন। সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) চিরাচরিত প্রথা– যা সাধারণত মেনে চলা হয় তাই প্রথা। প্রত্যেক সমাজে কিছু কিছু আচরণ বিধি গড়ে উঠে। অভ্যাসগতভাবে বা সুবিধার জন্য এই রীতিনীতিকে মানুষ মেনে চলে, কেউ লঙ্ঘন করে না। এভাবে রীতিনীতিগুলো ক্রমাগতভাবে অনুসরণের ফলে প্রথার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের দ্বারা স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভের মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। ইংল্যান্ডের সাধারণ আইনগুলো প্রথার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে।

(২) ধর্ম– ধর্ম আইনের অন্যতম উৎস। প্রাচীন কালে অনেক প্রথা ধর্মীয় বিধানের উপর গড়ে উঠে। ধর্মীয় গুরুরা রাষ্ট্র ও সরকারের প্রধান হিসেবে ধর্মীয় বিধান ও শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ধর্মীয় আইনগুলো প্রয়োগ করতেন। ফলে ধর্মীয় অনেক বিধানই আইনে পরিণত হয়। তাছাড়া প্রত্যেক ধর্মই দৈনন্দিন জীবনে মেনে চলার কতকগুলো বিধান নির্ধারণ করে যা আইনে পরিণত হয়। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ আল কোরআন সম্পত্তি বণ্টন, বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত বিধান জারি করেছে যা মুসলিম আইনের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে ধর্ম আইনের এক বিরাট উৎস।

(৩) বিচারকের রায়– প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোন মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে বিচারপতিগণ নিজেদের প্রজ্ঞা অনুযায়ী আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আইনের নতুন ধারা রচনা করেন এবং মামলাটি নিষ্পত্তি করেন। পরবর্তীতে অনুরূপ মামলার ক্ষেত্রে এইভাবে সৃষ্ট আইনটি নজির হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং এক পর্যায়ে আইন হিসেবে পরিগণিত হয়। এভাবে নির্মিত আইনকে 'বিচারক নির্মিত' আইন বলা হয়।

(৪) ন্যায়বোধ– বিচারকগণ যখন বিচার করতে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে আইনের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেন তখন তারা তাদের ন্যায়বোধ থেকে সম্পূর্ণরূপে নতুন আইন প্রণয়ন করে বিচার করেন। বিচারকের

ন্যায়বোধ ও রায় উভয়ই বিচারক নির্মিত আইন হলেও প্রচলিত আইনের বিস্তৃতি ঘটিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা নতুন আইন তৈরি করা হলে তাকে বিচারকের রায় বলে। অপরপক্ষে প্রজ্ঞার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নতুন আইন তৈরি করাকে ন্যায়বোধ বলে।

(৫) বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা ঃ আইনজ্ঞ পণ্ডিতগণ আইন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সাধারণ কতগুলো সূত্র উল্লেখ করেছেন। বিচারকগণ প্রয়োজনে সেগুলোকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে মামলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। মুসলিম আইনের ক্ষেত্রে হেদায়া ও আলমগিরির গুরুত্ব অপরিসীম। কোক, ব্ল্যাকস্টোন, ডাইসি, এরস্কিন মে এবং লাস্কি লিখিত গ্রন্থগুলো আইনের এক বিরাট উৎস। এরস্কিন লিখিত পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিস গ্রন্থটি শুধু বৃটেনে নয়, যেসব দেশে পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সে সব দেশে পার্লামেন্ট পরিচালনার নিয়ম সংক্রান্ত বিষয়ে এই পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়।

(৬) আইন পরিষদ ঃ আইন পরিষদ স্ব স্ব দেশের শাসন ও বিচারের প্রয়োজনে নতুন নতুন আইন রচনা করে এবং পুরাতন আইনের সংশোধন করে। তাই আইন পরিষদই আইনের সর্বাপেক্ষা বড় উৎস। বস্তুত আইন পরিষদ আইনের সার্বক্ষণিক উৎস।

(৭) জনমত ঃ আইন পরিষদ জনগণের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখেই আইন প্রণয়ন করে। জনমত যেমন চায় আইন পরিষদ তেমন আইনই প্রণয়ন করে। এজন্য ওপেনহ্যাম জনমতকে আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১১.১.৪ আইনের প্রকারভেদ

ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কের ভিত্তিতে আইনকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা– (১) বেসরকারী আইন, (২) সরকারী আইন এবং (৩) আন্তর্জাতিক আইন।

(১) বেসরকারী আইন– ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন মেনে চলা হয় তাকে বেসরকারী আইন বলে। বেসরকারী আইনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে।

(২) সরকারী আইন– ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রয়োগ করা হয় তাকে সরকারী আইন বলে। এই আইন আবার নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত হয় :

(ক) শাসনতান্ত্রিক আইন– এগুলো মৌলিক আইন যার দ্বারা রাষ্ট্রের ধরন, সরকারের ধরন, সরকারের বিভাগগুলোর মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ ও জনগণের সাথে সম্পর্ক নিরূপণ করা হয়।

(খ) প্রশাসনিক আইন– প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং জনগণের সঙ্গে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সম্পর্ক নিরূপণের জন্য যে আইন প্রণীত হয় তাকে প্রশাসনিক আইন বলে।

(গ) ফৌজদারী আইন– চুরি, ডাকাতি ও মারামারি সংক্রান্ত বিষয়গুলো যে আইনের দ্বারা মীমাংসা করা হয় তাকে ফৌজদারী আইন বলে।

(ঘ) দেওয়ানী আইন– টাকা-পয়সা ও জমি-জমা সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা যে আইনের দ্বারা করা হয় তাকে দেওয়ানী আইন বলে।

(ঙ) আন্তর্জাতিক আইন ঃ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে সমস্ত নিয়মগুলো সভ্য রাষ্ট্রসমূহ তাদের পারস্পরিক চলার ক্ষেত্রে মেনে চলে তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে।

১১.১.৫ আইন ও নৈতিকতা

আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক আলোচনা করতে গেলে আইন ও নৈতিকতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা দরকার। আইন বলতে বাধ্যতামূলক কতকগুলো আদেশ বা নিষেধকে বুঝায়। অপরপক্ষে নৈতিকতা বলতে সমাজের বিবেকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কতকগুলো ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের সমষ্টিকে বুঝায়। নিম্নে আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক আলোচনা করা হল :

প্রথমত, উভয়ের লক্ষ্য একই। আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং নৈতিকতা অভ্যন্তরীণ চিন্তাভাবনা ও মানসিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

দ্বিতীয়ত, অভিন্ন উৎস হতে উভয়ই জন্মলাভ করেছে। প্রথা, ধর্ম ও ন্যায়বোধ হতে আইন ও নৈতিকতা গড়ে উঠেছে।

তৃতীয়ত, আইন নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। নৈতিকতার উপর গড়ে না উঠলে আইন জনসাধারণের আনুগত্য লাভ করতে পারে না। ভারতে 'সারদা আইন' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ আইনে সতীদাহ প্রথা বিলোপ করা হয়েছে।

চতুর্থত, আইন নৈতিকতাকে প্রভাবিত করে। আইন অনেক অনৈতিক কাজ নিষিদ্ধ করে নৈতিকতাকে পরিবর্তন করতে বা নতুন নৈতিকতার জন্ম দিতে পারে।

আইন ও নৈতিকতার মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকলেও এদের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য রয়েছে :

প্রথমত, নৈতিকতার পরিধি আইন অপেক্ষা বিস্তৃত। কেননা আইন কেবলমাত্র বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু নৈতিকতা বাহ্যিক আচরণ এবং চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। খারাপ চিন্তা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও নৈতিকতার পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত, সকল আইন নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং সুবিধার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন– রাস্তার কোন এক ধার দিয়ে চলা বা না চলার সাথে নৈতিকতার কোন সম্পর্ক নেই।

তৃতীয়ত, আইন সুস্পষ্ট কিন্তু নৈতিকতা অস্পষ্ট। আইন প্রণয়ন ও ব্যাখ্যা করার জন্য বৈধ ও সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ থাকে। কিন্তু নৈতিকতার ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ভিক্ষা দেওয়া কারও নিকট অনৈতিক আবার কারও নিকট নৈতিক কাজ।

চতুর্থত, আইনের পশ্চাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতার মঞ্জুরী থাকে। রাষ্ট্র আইন ভঙ্গকারীর বিচারের ও শাস্তির ব্যবস্থা করে। কিন্তু নৈতিকতা বিরোধী কাজ করলে কোন শাস্তি পেতে হয় না। অবশ্য এর পিছনে সামাজিক ঘৃণা বা বিবেকের দংশন প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

উপরিউক্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আইন ও নৈতিকতা উভয়ই একই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে।

১১.১.৬ আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক

আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এ নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন, রাষ্ট্র আইনের জন্মদাতা এবং আইনের উর্ধ্বে। আবার কেউ কেউ বলেছেন রাষ্ট্র আইনের অধীন। বিশ্লেষণপন্থীদের মতে "রাষ্ট্র আইনের জনক"। অস্টিন বলেন, "সার্বভৌমের আদেশই আইন।" সার্বভৌমই আইনের ভিত্তি। সুতরাং আইন রাষ্ট্রের অধীন।

কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক মতবাদপন্থীদের মতে রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্ব থেকেই আইন বিরাজমান ছিল। রাষ্ট্র এগুলোকে গ্রহণ করেছে ও স্বীকৃতি দান করেছে। স্যার হেনরী মেইন ও স্যার ফ্রেডারিক পোলক উপরিউক্ত ধারণা পোষণ করেন। সমাজবিজ্ঞানী দুগুই বলেন, "আইন হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের সেই সকল নিয়মাবলী যা মানুষ সামাজিক জীবনের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মেনে চলতে রাজী হয়েছে।" স্যার হেনরী মেইন ঘোষণা করেছেন, "আইনের জন্ম রাষ্ট্রের জন্মের অনেক পূর্বে।" লাস্কিও অনুরূপ ধারণা পোষণ করে বলেন, "আমি আমার অভিজ্ঞতার দ্বারাই আইনের বৈধতার সন্ধান পাই।" সুতরাং রাষ্ট্র আইনের উর্ধ্বে নয়।

প্রকৃত সত্য উভয় মতবাদের মধ্যে নিহিত। আইন রাষ্ট্রের উর্ধ্বে যেমন ঠিক তেমনি রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন ও বাতিল করতে পারে। আয় এম ম্যাকাইভার বলেন, "রাষ্ট্র আইনের পিতা ও পুত্র।" রাষ্ট্রের

সাংবিধানিক আইন গণপরিষদ রচনা করে আর রাষ্ট্র এবং সরকার এর অধীন হয়ে পড়ে। তদ্রূপ রাষ্ট্র তার এজেন্সীর মাধ্যমে সাধারণ আইন এমনকি সাংবিধানিক আইনকেও পরিবর্তন করে। সুতরাং আইন ও রাষ্ট্রের অবস্থান সমান্তরাল। আইন লঙ্ঘন করলে রাষ্ট্র যেমন শাস্তির ব্যবস্থা করে তেমনি আইন লঙ্ঘনের কারণে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও মামলা করা যায়। প্রকৃত সত্য এই যে, আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র সুশৃঙ্খল জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

সার-সংক্ষেপ

বিশ্বের সবকিছু নিয়মের অধীন। আইন মানুষের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে সহায়তা করে। অনেকে অন্যভাবে আইনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। বস্তুত আইন হল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত নিয়মের সমষ্টি। অনেকগুলো উৎস হতে আইন উৎপত্তি লাভ করেছে। আধুনিক কালে আইন পরিষদ আইনের সবচেয়ে বড় উৎস। আইন ও নৈতিকতা একই উৎস থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং এরা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। আইন ও নৈতিকতার লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। আইন এবং রাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আইন ও রাষ্ট্র ভিন্নতর বিষয় হলেও এদের মধ্যে সম্পূরক সম্পর্ক বিদ্যমান। এদের অবস্থান সমান্তরাল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। আইন বলতে কি বুঝায় ?
- ক. জনগণের আদেশ
- খ. সরকারের আদেশ
- গ. আইন বিভাগের আদেশ
- ঘ. সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশ

২। আনুগত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে কে আইনের সংজ্ঞা দিয়েছেন ?
- ক. হল্যান্ড
- খ. অষ্টিন
- গ. উড্রো উইলসন
- ঘ. ব্রাইস

৩। কোনটি আইনের বৈশিষ্ট্য ?
- ক. চিরন্তন
- খ. অবশ্য পালনীয়
- গ. স্থায়ী
- ঘ. পরিবর্তনশীল

৪। অধ্যাপক হল্যান্ড আইনের কয়টি উৎসের কথা বলেছেন ?
- ক. পাঁচটি
- খ. চারটি
- গ. ছয়টি
- ঘ. সাতটি

৫। জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার আইন কোনটি ?
- ক. বেসরকারী আইন
- খ. সরকারী আইন
- গ. দেওয়ানী আইন
- ঘ. ফৌজদারী আইন

পাঠ– ২ : আইন মান্য করার কারণ, আইনের শাসন এবং আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- আইন মেনে চলা হয় কেন তা বলতে পারবেন।
- আইন কিভাবে সামাজিক পরিবর্তন সাধন করে তা বলতে পারবেন।
- আইনের শাসনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- প্রকৃত গণতন্ত্রে নাগরিক অধিকারের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্বাধীনতার সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- স্বাধীনতার রক্ষাকবচসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১১.২.১ আইন মান্য করার কারণ

মানুষ কেন আইন মেনে চলে এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অতি প্রাচীনকালে শাসককে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করা হত। সুতরাং রাজার আদেশ মেনে চলা ধর্মীয় কর্তব্য মনে করা হয়েছে। সামাজিক চুক্তিবাদীদের মতে সম্মতিই আইন মেনে চলার কারণ। জনগণের সম্মতিতেই রাষ্ট্রীয় আইন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও জনগণের আস্থাশীল আইন পরিষদ আইন রচনা করে বলে জনগণ আইন মেনে চলে। হিউম, স্যার হেনরী মেইন প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, অভ্যাস বশত মানুষ আইন মেনে চলে। টমাস হবসের মতে মানুষ ভয়ে আইন মেনে চলে। কেননা আইন অমান্য করলে শাস্তি পেতে হয়। অনেকে আবার মনে করেন বৈধ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইন প্রণীত হয় বলেই আইন মেনে চলা হয়। রাষ্ট্র একটি বৈধ প্রতিষ্ঠান। সুতরাং রাষ্ট্র প্রণীত আইন অমান্য করা অবৈধ।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আইন মেনে চলার কারণ হিসাবে আইনের প্রয়োজনীয়তাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। আইন ছাড়া সুশৃঙ্খল জীবন-যাপন সম্ভব নয়। আইনের অনুপস্থিতিতে নৈরাজ্য দেখা দিবে। জোর যার মুল্লুক তার অবস্থার সৃষ্টি হবে। কোন মানুষের নিরাপত্তা থাকবে না। আর্নেস্ট বার্কার বলেন, মানুষ আইন মেনে চলে কারণ আইন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। তিনি আরও বলেন যে, রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে মানবিক সম্পর্ক গড়ে তুলে এবং ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে। এরিস্টটল মনে করেন যে, আইনের নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষ কর্তৃত্বের কারণেই আইন আনুগত্য লাভ করে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে আইন স্বাধীনতা সংরক্ষণ করে, নিরাপত্তা দান করে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে বলেই মানুষ আইন মেনে চলে। সবচেয়ে বড় কথা, রাষ্ট্র তার আইনের দ্বারা নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করে। এ কারণে মানুষ আইন মেনে চলে।

১১.২.২ আইন ও সামাজিক পরিবর্তন

সমাজ স্থির থাকে না। পরিবর্তনশীলতা সমাজের বৈশিষ্ট্য। সামাজিক পরিবর্তন বলতে বুঝায় সমাজের কৃষ্টি, রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, উৎপাদন-বণ্টন পদ্ধতি, সামাজিক মূল্যবোধ ও জীবন আদর্শের পরিবর্তন। আইন বিভিন্নভাবে সামাজিক পরিবর্তন সাধন করতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন, উৎপাদন-বণ্টন ব্যবস্থায় পরিবর্তন অথবা সামাজিক কুসংস্কারের উচ্ছেদ আইনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম বাহন হিসেবে আইন পুরাতন ব্যবস্থা বাতিল এবং নতুন কোন ব্যবস্থা সংযোজন করে সামাজিক পরিবর্তন সাধন করতে পারে। যেমন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করলে শিক্ষিতের হার বাড়তে পারে এবং তা ব্যাপকভাবে সামাজিক আচরণ ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তেমনি পরিমিতিবোধ সৃষ্টি ও সামাজিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের জন্য কঠোর আইন কার্যকর হতে

পারে। সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, প্রগতিশীল কর ধার্য করা, আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ ও আইনের মাধ্যমে বাণিজ্য নীতি নির্ধারণ করে আইন সমাজের অর্থনৈতিক জীবন ধারার পরিবর্তন করে।

আইন যেমন সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসে তেমনি সামাজিক পরিবর্তনের কারণে নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। শিক্ষার অগ্রগতি, বিজ্ঞানের আবিষ্কার বা শিল্পায়নের ফলে সামাজিক পরিবর্তন ঘটলে পরিবর্তিত ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি বিধানের স্বার্থেই প্রয়োজনীয় আইন প্রণীত হয়। যেমন কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ পদ্ধতির প্রচলন ঘটায় সেচ, সার ও বীজ সংরক্ষণাগার বাস্ত বায়নের জন্য নতুন নতুন আইন তৈরি করতে হয়েছে।
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় আইন ও সামাজিক পরিবর্তন একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

১১.২.৩ যথার্থ আইনের শাসন

শুধু আইন থাকলেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এমন নয়। অনেক সময় আইন নিপীড়নের যন্ত্রে পরিণত হয়। শাসকশ্রেণি আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার করে মানুষের অধিকার খর্ব করতে পারে। তাই শাসকের ইচ্ছা অনুযায়ী আইন প্রণীত হবে না। আইন অবশ্যই জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন অনুসারে প্রণীত হবে। শাসক ও শাসিত সমভাবে আইনের অধীন হবেন। তবেই যথার্থ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। আইনের শাসনের মূলকথা নাগরিকের অধিকার রক্ষা করা। তাই স্বেচ্ছাচারমূলক আইন কোন মতেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

যথার্থ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই আইনের নিকট সমান মর্যাদা লাভ করবে। যথার্থ আইনের শাসন কতকগুলো বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন– প্রথমত, ব্যক্তির অধিকারকে কোন কর্তৃপক্ষ লঙ্ঘন করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, আইন সবকিছুর ঊর্ধ্বে। শাসকের ইচ্ছা নয়, আইনই শাসন করবে। তৃতীয়ত, অপরাধীর অপরাধ সাপেক্ষে তাকে আইন অনুযায়ী শাস্তি দিতে হবে। চতুর্থত, সরকার আইনের অধীন। অর্থাৎ সরকারী কর্তৃত্ব আইন থেকে প্রাপ্ত। পঞ্চমত, আইনের যথাযথ বিধি ছাড়া কাউকে আটক করা যাবে না। ষষ্ঠত, আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। সপ্তমত, আটককৃত ব্যক্তিকে যত তাড়াতড়ি সম্ভব আদালতে হাজির করতে হবে। অষ্টমত, সকলের জন্য একই ধরনের আদালত থাকবে এবং অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

আইনের শাসনের মূল লক্ষ্য নাগরিক অধিকার রক্ষা করা। গণতান্ত্রিক সমাজে আইনের শাসনের কথা তাই খুব জোরে-সোরে উচ্চারিত হয়। কিন্তু স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয় ছাড়া আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এজন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিচারপতিদের স্বাধীনতা রক্ষা ও তাদের চাকরির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

১১.২.৪ নাগরিক অধিকার ও প্রকৃত গণতন্ত্র

প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিক অধিকার মর্যাদা লাভ করে। নাগরিক অধিকার বলতে রাষ্ট্র ও সমাজ স্বীকৃত কতকগুলো সুযোগ সুবিধাকে বুঝায়। এই সুযোগসুবিধাগুলো ছাড়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না। অন্য কথায় সুযোগ-সুবিধাগুলো সভ্য জীবন যাপনের শর্ত। সুতরাং নাগরিক অধিকার বা সভ্য জীবন যাপনের জন্য যে শর্তগুলো প্রয়োজন তা যেন সকলেই ভোগ করতে পারে সেদিকে রাষ্ট্রকে নজর দিতে হবে। বৈদ্যুতিক আলো, চলাচলের রাস্তা, পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী, বিনোদনের ব্যবস্থা, বেচা-কেনার জন্য বাজার, রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার ব্যবস্থা, শৌচাগার, যাত্রী ছাউনি, মশক নিধন, গ্যাস সরবরাহ, পার্ক প্রভৃতির সুযোগ সুবিধা সবার জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। এইসব নাগরিক সুবিধার সাথে যদি কতকগুলো সামাজিক অধিকার, যেমন– অবাধে চলাফেরা, লেখাপড়া, সম্পত্তিভোগ, ধর্ম পালন, সভা-সমিতি গঠন ও বিনোদনমূলক কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকে তবে সুন্দর নাগরিক জীবন গড়ে উঠে।

একমাত্র গণতন্ত্র এবং প্রকৃত গণতন্ত্রই নাগরিক অধিকারকে গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিতে পারে। গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের সরকার। সুতরাং নাগরিকদের নাগরিক অধিকার বৃদ্ধির জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা কেবলমাত্র প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকারই গ্রহণ করতে পারে। সেজন্য জনগণকে সজাগ হতে হবে এবং ভাল লোককে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করতে হবে। তাছাড়াও জনগণকে সচেতন হতে হবে এবং সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করে নাগরিক অধিকার আদায় করে নিতে হবে।

১১.২.৫ স্বাধীনতার সংজ্ঞা

স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ খরনবৎঃ। খরনবৎঃ শব্দটি ষরনবৎ হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। ষরনবৎ শব্দের অর্থ মুক্ত। তাই উৎপত্তিগত অর্থে স্বাধীনতা বলতে অবাধ ক্ষমতা বুঝায়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অবাধ স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা হল নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা। হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন, "প্রত্যেকে যা খুশি তাই করতে পারে যদি সে অন্যের অনুরূপ স্বাধীনতায় বাধা সৃষ্টি না করে।" সীমাবদ্ধতা আরোপ ছাড়া কারও পক্ষে কোন স্বাধীনতা উপভোগ করা সম্ভব হবে না। জনগণের সরকার জনগণের স্বার্থেই এবং জনগণের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যক্তির অবাধ ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করবে। স্বাধীনতার সংজ্ঞা দিয়ে টি,এইচ,গ্রীন বলেন, "যা উপভোগ করার এবং সম্পন্ন করার যোগ্য তা উপভোগ ও সম্পাদন করার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলে।"

অধ্যাপক লাস্কি ইতিবাচক ও নেতিবাচক অর্থে স্বাধীনতার সংজ্ঞা দিয়েছেন। নেতিবাচক অর্থে স্বাধীনতা বলতে বুঝায় স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করা, আর ইতিবাচক অর্থে স্বাধীনতা বলতে বুঝায় স্বাধীনতার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। সুতরাং ইতিবাচক অর্থেই স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থবহ হয়। তিনি স্বাধীনতার সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, "যে অনুকূল পরিবেশে মানুষ জীবনের চরম ও পরম বিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করে তার সংরক্ষণকে স্বাধীনতা বলে।" সুতরাং স্বাধীনতা বলতে আমরা সমাজ জীবনের সেইসব অনুকূল অবস্থাকে বুঝি যা ব্যক্তির পূর্ণতা প্রাপ্তি এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করে।

১১.২.৬ স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ

অধ্যাপক লাস্কি স্বাধীনতার তিনটি শ্রেণিবিভাগ করেছেন। এগুলো হচ্ছে – ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

(১) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা– ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলতে ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বুঝায়। ধর্মপালন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটি উত্তম উদাহরণ। তাছাড়া গৃহের গোপনীয়তা রক্ষা, চিঠির গোপনীয়তা রক্ষা, জামিন পাওয়ার অধিকার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উদাহরণ।

(২) রাজনৈতিক স্বাধীনতা– রাজনৈতিক বিষয়াদিতে অংশ গ্রহণের অধিকারকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে। নিজের পছন্দ অনুসারে ভোট দেওয়ার, নির্বাচিত হওয়ার, মতামত প্রকাশ, প্রতিবাদ ও সরকারের সমালোচনা করার স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে। অধ্যাপক লাস্কির মতে, "রাষ্টীয় ব্যাপারে সক্রিয় হওয়ার ক্ষমতাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে।" অধ্যাপক লাস্কি রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা ও খোলাখুলি সংবাদ সরবরাহ করার কথা বলেছেন।

(৩) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা– অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে অধ্যাপক লাস্কি অভাব ও বেকারত্ব থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। বস্তুত অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসগৃহ ও চিকিৎসার সুযোগকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মতে "অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ অভাব থেকে মুক্তি।"

(৪) সামাজিক স্বাধীনতা– সমাজ যে সমস্ত অধিকার সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করে তা উপভোগের ক্ষমতাকে সামাজিক স্বাধীনতা বলে। এগুলো সভ্য সমাজ ব্যবস্থার শর্ত। বিবাহ, সম্পত্তি অর্জন, বসতবাটি নির্মাণ, লেখাপড়া শেখা ইত্যাদিকে সামাজিক স্বাধীনতা বলে।

(৫) প্রাকৃতিক স্বাধীনতা– মানব প্রকৃতি থেকে উৎসারিত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করাকে প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বলে। অন্যকথায় জন্মগতভাবে মানুষ যে সমস্ত সুযোগ দাবী করতে পারে সেগুলোই প্রাকৃতিক অধিকার। জীবন ধারণের অধিকার, আহার ও নিদ্রার অধিকার, বিবাহের অধিকার, সম্পত্তি অর্জনের অধিকার এবং এগুলো ভোগ করার স্বাধীনতাকে প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বলে।

(৬) জাতীয় স্বাধীনতা– অন্য রাষ্ট্রের আক্রমণ থেকে নিজ রাষ্ট্রকে রক্ষা করা বা অন্য কোন জনসমষ্টির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে কোন জনসমষ্টির অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষমতাকে জাতীয় স্বাধীনতা বলে। এই স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের সমার্থক।

১১.২.৭ স্বাধীনতার রক্ষাকবচ

যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা যায় সেগুলোকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলে। এগুলো ছাড়া স্বাধীনতা অর্থবহ হয় না। আধ্যাপক লাস্কি বলেন, "সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া অধিকাংশ লোক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না।" নিম্নে স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

(১) আইন– আইন আছে বলে অধিকাংশ লোক স্বাধীনতা ভোগ করে। আইনের শাস্তির ভয়ে কেউ অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। হব্‌সের মতে "যেখানে আইন নেই, সেখানে কর্তৃত্ব নেই। আর যেখানে কর্তৃত্ব নেই সেখানে স্বাধীনতা নেই।" বস্তুত আইন স্বাধীনতার শর্ত।

(২) গণতন্ত্র– গণতন্ত্র স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। গণতন্ত্রে জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস। সুতরাং শাসকগোষ্ঠী জনগণের স্বাধীনতার বিরোধী কাজ করতে পারে না। আগামী দিনে জনগণের সমর্থন হারানোর ভয়ে জনগণের স্বাধীনতায় সরকার হস্তক্ষেপ করে না।

(৩) শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের ঘোষণা– সংবিধানে মৌলিক অধিকার ঘোষণা করা হলে সেগুলো সাংবিধানিক মর্যাদা লাভ করে। ফলে মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করলে সংবিধান লঙ্ঘনের মত অপরাধ সংঘটিত হয়। এ কারণে কেউ মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে না।

(৪) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ– রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ যদি স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত না হয় তবে স্বাধীনতা থাকে না। যদি আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার ক্ষমতা পৃথক করা হয় এবং এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে তবে ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ এবং জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা পায়।

(৫) আইনের অনুশাসন– সমাজের সকল মানুষ যদি একই আইন অনুযায়ী একই আদালতে বিচার লাভ করে, আইনের চোখে যদি সকলেই সমান হয় তবে স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আইনের অনুশাসন না থাকলে দুর্বল মানুষেরা সবলের স্বার্থের শিকারে পরিণত হবে এবং স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে না।

(৬) দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা– শাসকের জবাবদিহিতা এবং জনপ্রতিনিধিদের নিকট দায়িত্বশীলতা থাকলে শাসন বিভাগ স্বৈরাচারী হতে পারবে না। ফলে জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা পাবে।

(৭) প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা– গণভোট, গণউদ্যোগ, জনমত নির্ধারণ ও পদচ্যুতি ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করলে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের স্বৈরাচার বন্ধ হবে এবং স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে।

(৮) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা– বিচার বিভাগ স্বাধীন হলে প্রভাবশালী মহল এবং সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে আইন অনুযায়ী বিচারকগণ মামলার ফায়সালা করতে পারবেন। ফলে ব্যক্তির স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হবে না। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করতে হবে। বিচারপতিদের চাকরির নিশ্চয়তা বিধান এবং চাকরির শর্তাবলী সংবিধানে উল্লেখ করতে হবে। লর্ড বাইস বলেন, "কোন রাষ্ট্রের নাগরিকরা কি পরিমাণ স্বাধীন তা সে দেশের বিচার বিভাগের কর্মকুশলতার দ্বারা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।"

(৯) বিশেষ সুযোগ-সুবিধার তিরোধান– অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন যে, স্বাধীনতা সুরক্ষার জন্য বিশেষ সুযোগের অবসান ঘটাতে হবে এবং ক্ষমতা লাভের ক্ষেত্রে সকলের সমান সুযোগ থাকা দরকার।

(১০) স্বাধীনতা যেন কারো ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না– স্বাধীনতা অন্যের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হলে তা আর স্বাধীনতা থাকে না। মালিকের মর্জির উপর শ্রমিকের জীবিকার্জন নির্ভরশীল হলে শ্রমিকের স্বাধীনতা থাকে না। অতএব মালিক শ্রমিক একই আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। মালিকের নিছক অসন্তুষ্টির কারণে যেন কারও জীবিকার পথ রুদ্ধ না হয়ে যায়।

(১১) পক্ষপাতহীন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম– পক্ষপাতহীন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম স্বাধীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ। তবে এই লক্ষ পূর্ণরূপে অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ বিভিন্ন স্বার্থের গোষ্ঠী তাদের গোষ্ঠিস্বার্থ আদায়ের জন্য সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে এবং শক্তিধরদের নিকট সরকার নত হয়ে থাকে। তবুও যতদূর সম্ভব সরকারের কাজে পক্ষপাত যেন কম হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

(১২) সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি– নাগরিক স্বাধীনতা বর্তমানকালের একটি জটিল সমস্যা। স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে সরকারের নিরপেক্ষতা যেমন দরকার তেমনি দরকার জনগণের সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি। জনগণের সাহসিকতা এবং সরকারের সম্ভাব্য ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো স্বাধীনতার সর্বাপেক্ষা বড় রক্ষাকবচ। গ্রীক দার্শনিক পেরিক্লিস বলেছেন, "স্বাধীনতার গোপন কথাই হল সাহস।" অধ্যাপক লাস্কি যথার্থই বলেছেন "ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদের হুমকি স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ।"

১১.২.৮ আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক

আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নিরূপণ করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি জটিল সমস্যা এবং এ ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী মত রয়েছে। একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে, আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন সংঘর্ষ নেই, বরং আইন স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। অপর দল মনে করেন যে, আইন স্বাধীনতার বিরোধী এবং আইন যত বেশি হবে স্বাধীনতা তত কম হবে। উইলিয়াম গডউইনের মতে, "আইন ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠান।" প্রকৃতপক্ষে দুটিই চরম মত। সব আইন স্বাধীনতা রক্ষা করে না আবার প্রত্যেকটি আইন স্বাধীনতার বিরোধী নয়। স্বেচ্ছাচারী শাসন ও জবরদস্তিমূলক আইন যেমন স্বাধীনতাকে খর্ব করে তেমনি যখন জনগণের আস্থাশীল সরকার জনগণের ইচ্ছার প্রতীক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে তখন তা অবশ্যই স্বাধীনতার অনুকূল। তাদের সম্পর্কের অনুকূল দিকগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) আইন স্বাধীনতার রক্ষক। কেননা আইন না থাকলে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি প্রতিষ্ঠিত হত। আইনের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেই কেবলমাত্র সবলের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা করা যায়। আইন ও আদালত আছে বলেই অন্যের স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করতে সাহস করে না।

(২) আইন স্বাধীনতার শর্ত ও অভিভাবক। যখন কোন নতুন আইন প্রণীত হয় তখন অসংবদ্ধ স্বাধীনতা সংবদ্ধ ও স্বচ্ছ হয়। স্বাধীনতা আইনের আওতায় বিকশিত হয়।

(৩) আইন স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। সভ্য জীবনের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী আইনের দ্বারা সুরক্ষিত ও সম্প্রসারিত হয়। কর্মের শর্তাবলী যেমন শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, ন্যূনতম মজুরি, কাজের সময়সীমা, কর্মে প্রবেশের বয়স, নারীদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কর্মে নিয়োগ, সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রমিকদের শ্রান্তি ও বিনোদন, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষয়ক্ষতির বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা প্রভৃতি আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে। এতে স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। মানুষের সুখ সুবিধার জন্য এ ধরনের আইনের যত বিস্তৃতি হয় স্বাধীনতাও তত সম্প্রসারিত হয়।

তবে এটা ঠিক যে সকল আইন স্বাধীনতার সহায়ক নয়। কতকগুলি আইন স্বাধীনতার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে। অনেক ধরনের জরুরি আইন ও কালাকানুন সরকারের ক্ষমতাকেই শুধু বৃদ্ধি করে আর জনগণের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে। কিন্তু আইনের মধ্যে যদি জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে তবে ভয়ের কিছু থাকে না। আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা এবং জনগণের স্বাধীন ক্ষমতা ব্যবহারের সঙ্গতি বিধানই আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্কের সঠিক দিকদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

১১.২.৯ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র পরস্পর নির্ভরশীল। উভয়ের অবস্থান সমান্তরাল। স্বাধীনতা না থাকলে গণতন্ত্র অর্থহীন। আবার গণতন্ত্রই স্বাধীনতার পথ সুগম করে। স্বাধীনতার অর্থ অপরের দ্বারা বাধাগ্রস্থ না হয়ে নিজের অধিকার ভোগ করা। তদ্রূপ অপরের সমঅধিকারে হস্তক্ষেপ না করাই স্বাধীনতার মূল কথা। এজন্য স্বাধীনতা বলতে এমন এক পরিবেশের সংরক্ষণ বুঝায় যেখানে ব্যক্তি তার সর্বোত্তম সত্তা বিকাশের সুযোগ পায়। গণতন্ত্রই এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করে সকলের আত্মোপলব্ধির পথ সুগম করতে পারে। কারণ গণতন্ত্র এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থা যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থনে সরকার গঠিত হয়। এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় আইনসিদ্ধভাবে নাগরিকের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গণতন্ত্র হল নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যেখানে সাংবিধানিকভাবে জনগণের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় এবং সাংবিধানিক নিশ্চয়তার মাধ্যমে স্বাধীনতা বলবৎকরণের ব্যবস্থা করা হয়। গণতন্ত্র আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করে। তাই হারানো স্বাধীনতা আদালতের নিরপেক্ষ রায়ে পুনর্বহাল হয়। তাছাড়া গণতন্ত্র জনগণের সম্মতিতে রচিত আইনের মাধ্যমে সাম্যভিত্তিক আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি করে স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করতে পারে। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে মানুষ জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে পারে। সুতরাং স্বাধীনতা যেমন গণতন্ত্রের শর্ত তেমনি গণতন্ত্রই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে।

সার-সংক্ষেপ

আইনের নিরাসক্ত গুণের কারণে মানুষ আইন মেনে চলে। আইন মানলে মানুষের সুবিধা হয়। আইন শুধু মানুষের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে না। সমাজের বুকে পরিবর্তন ঘটায়। স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতা না থাকলে মানুষ সমাজের সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারে না। স্বাধীনতার রূপ বিভিন্ন। কিন্তু এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হলে কতকগুলো রক্ষাকবচ সংরক্ষণ করা দরকার। এসব রক্ষাকবচের মধ্যে নাগরিকবৃন্দের সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ। আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। আইন না থাকলে স্বাধীনতা থাকে না আবার স্বাধীনতা না থাকলে আইন কার্যকর করা যায় না। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র পরস্পর নির্ভরশীল। গণতন্ত্র স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ সৃষ্টি করে। আবার স্বাধীনতা গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র একে অপরের সম্পূরক।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন– ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আইন মান্য করার কারণ কি ?
ক. না মানলে পাপ হবে
খ. শাস্তির ভয়ে
গ. নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের জন্য
ঘ. রাষ্ট্র আইন তৈরি করে তাই

২। আইনের শাসনের অর্থ কি ?
ক. আইন অনুযায়ী শাসন করা
খ. সকলের জন্য একই আইন প্রয়োগ করা
গ. আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান
ঘ. একই আদালতে সকলের বিচার করা

৩। স্বাধীনতার অর্থ কি ?
ক. যা খুশি তাই করা
খ. সকলে সমান অধিকার ভোগ করা
গ. ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল অবস্থা
ঘ. বুঝে শুনে চলা

৪। স্বাধীনতার গুরুত্বপূর্ণ রক্ষা কবচ কোনটি ?
ক. গণতন্ত্র
খ. আইনের অনুশাসন
গ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
ঘ. জনগণের সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি

৫। আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক কীরূপ ?
ক. পরস্পর বিরোধী
খ. সম্পূরক
গ. আইন স্বাধীনতার রক্ষক
ঘ. আইন স্বাধীনতা বৃদ্ধি করে

পাঠ– ৩ : স্বাধীনতা এবং নাগরিক ও সরকারের দায়িত্বশীলতা

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে নাগরিক ও সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১১.৩.১ স্বাধীনতা এবং নাগরিক ও সরকারের দায়িত্বশীলতা

স্বাধীনতা সকলেরই কাম্য। কিন্তু স্বাধীনতা এমনি আসে না। সকলের উন্নত চেতনা ও দায়িত্ব বোধের দ্বারাই স্বাধীনতা নিশ্চিত হতে পারে। কেননা একজন অপরের বিরুদ্ধে যতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করতে চায় অপরকেও ততটুকু স্বাধীনতা ভোগের অধিকার দিতে হবে। তার অর্থ এই যে, নিজের ও অন্যের স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, একজনের স্বাধীনতা মানে অন্যের কিছু ত্যাগ। অন্যের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করে নিজের স্বাধীনতা ভোগ করা যাবে না। তাই স্বাধীনতার জন্য জনগণের পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে।

শুধু নাগরিকের একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীলতা যথেষ্ট নয়। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারেরও জনগণের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। তদ্রূপ জনগণও যদি সরকার ও রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন না করে তবে সরকার জনগণের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করতে ব্যর্থ হবে। তাই জনগণকে আইন ও সরকারের কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য দিতে হবে। তাদের প্রতি আরোপিত কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, কখনও সরকার জনগণের স্বাধীনতার পরিপন্থী ব্যবস্থা গ্রহণ করে কিনা। ক্ষেত্র বিশেষে সরকারই স্বাধীনতার সর্বাপেক্ষা বড় শত্রুতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে জনগণকে সজাগ থেকে সরকারকে সঠিক দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য করতে হবে। জনগণকে সচেতনভাবে সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধের জন্য প্রতিবাদ করতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। কেননা অধ্যাপক লাস্কির মতে, "ক্ষমতা অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধই স্বাধীনতা।"

স্বাধীনতা রক্ষার ব্যপারে সরকারের দায়িত্বশীলতাই বেশি। কেননা নির্ধারিত মেয়াদের জন্য সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং এ মেয়াদে তারা স্বাধীনতা রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য ভাল কাজ করে নজির সৃষ্টি করলে স্বাধীনতা রক্ষা ও ভোগের ঐতিহ্য রচিত হয়। পরবর্তী সরকারও এই ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে পারে। সরকারকে মনে করতে হবে ক্ষমতা জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত একটি পবিত্র আমানত। এর সদ্ব্যবহার করে জনগণের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে হবে। সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে জনগণের ন্যূনতম প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। জনগণকে শিক্ষিত করে তাদেরকে সচেতন করতে হবে। ফলে জনগণও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ হবে। শিক্ষার পথ সুগম করে জনগণের মানসিকতার বিকাশ সাধন করতে হবে। যথার্থ আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে সরকার দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিলে তবেই স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে।

সার-সংক্ষেপ

স্বাধীনতা সকলেই চায়। কিন্তু স্বাধীনতা ভোগ করতে হলে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সজাগ থাকতে হবে। সরকারকেও জনগণের স্বার্থের দিকে নজর দিতে হবে এবং জনগণকে শিক্ষিত ও সচেতন করতে হবে। যাতে জনগণ নিজেরাই স্বাধীনতার জন্য সচেতন থাকতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। স্বাধীনতা রক্ষায় নাগরিকের দায়িত্ব কি ?

ক. ত্যাগ স্বীকার করা
খ. শিক্ষিত হওয়া
গ. কর্তব্য পালন করা
ঘ. সজাগ ও সচেতন দৃষ্টি রাখা

২। স্বাধীনতা সংরক্ষণে সরকারের দায়িত্ব কেমন হওয়া উচিত ?

ক. স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া
খ. নজির সৃষ্টি করা
গ. ভাল কাজ করা
ঘ. জনগণকে শিক্ষিত ও সচেতন করা

পাঠ– ৪ ঃ সাম্যের সংজ্ঞা ও অর্থ, বিভিন্ন রূপ, সাম্য ও গণতন্ত্র।

উদ্দেশ্য ঃ এই পাঠ শেষে আপনি–

- সাম্যের সংজ্ঞা দিতে পারবেন এবং এর অর্থ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার সাম্যের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- সমাজভেদে সাম্যচেতনার বিভিন্নতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- সাম্য ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১১.৪.১ সাম্যের সংজ্ঞা ও অর্থ

সাধারণভাবে সাম্য বলতে সকল মানুষকে সমান বুঝায়। বাস্তবে মানুষ সমান নয়। দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে মানুষ অসমান। এছাড়া প্রাকৃতিক কারণে এবং পরিবেশগত সুযোগ সুবিধার জন্য মানুষে মানুষে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। দৈহিকভাবে কেউ দুর্বল আবার কেউ বলবান, কেউ প্রতিভাধর আবার কেউ স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হয়। তবুও মানুষ যুগে যুগে সাম্যের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে। আন্দোলন করেছে এবং জীবন দিয়েছে। আমেরিকার ১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলিষ্ঠভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, "সৃষ্টির দিক হতে সকল মানুষ সমান।" অনুরূপভাবে ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবে নাগরিক অধিকারের ঘোষণায় বলা হয়েছে "মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং অধিকারের ক্ষেত্রে সমান থাকে।" তাহলে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কি? এর অর্থ এই যে, মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকলেও সমাজ ও রাষ্ট্রসৃষ্ট সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে তারতম্য করা চলবে না।

সাম্যের ধারণা কয়েকটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রথমত, সাম্য বলতে একটি সমতা বিধানকারী ব্যবস্থাকে বুঝায়। এর অর্থ উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকে এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যাতে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমে যায়।

দ্বিতীয়ত, সাম্যের অর্থ বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অবসান। রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে কোন তারতম্য করা যাবে না।

তৃতীয়ত, সকলের জন্য যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা। এর অর্থ সুযোগের অভাবে কোন প্রতিভা যেন নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১১.৪.২ সাম্যের বিভিন্ন রূপ

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্যের বিভিন্নমুখী প্রকাশ ঘটে থাকে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাম্যের ধারণার অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তাই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক, আইনগত প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্যের ব্যাখ্যা করে থাকেন। এগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) সামাজিক সাম্য– জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সমাজের সদস্য হিসেবে সকলেই যখন সমান মর্যাদা লাভ করে তখন তাকে সামাজিক সাম্য বলে। সামাজিক অধিকারগুলো সকলেই সমানভাবে ভোগ করে।

(২) রাজনৈতিক সাম্য– সকল মানুষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা নির্বিশেষে যখন সমানভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করে তখন তাকে রাজনৈতিক সাম্য বলে। ভোটাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে যখন কোনরূপ তারতম্য থাকে না এবং রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত দেওয়ার ব্যাপারে যখন সবার জন্য সমান সুযোগ উন্মুক্ত হয় তখন রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৩) অর্থনৈতিক সাম্য– পেশা নির্বাচন এবং জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রসমূহে প্রবেশের ক্ষেত্রে যখন কোন তারতম্য থাকে না তখন তাকে অর্থনৈতিক সাম্য বলে। নিম্নলিখিত পাঁচটি দিক থেকে অর্থনৈতিক সাম্য অনুধাবনযোগ্য :

(ক) যোগ্য ও ইচ্ছুক ব্যক্তিদের বেকার না থাকা।
(খ) প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী উপযুক্ত মজুরী লাভ।
(গ) আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত শ্রমদান।
(ঘ) চাকরি ও মজুরি লাভের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বিধান।
(ঙ) সম্পদের সুষম বণ্টন।

(৪) আইনগত সাম্য– আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং সকলের সমানভাবে আইনের আশ্রয় পাওয়ার অধিকারকে আইনগত সাম্য বলে।

(৫) প্রাকৃতিক সাম্য– জন্মগতভাবে সকলেই সমান – এই ধারণাকে প্রাকৃতিক সাম্য বলে।

১১.৪.৩ সমাজভেদে সাম্য চেতনার ভিন্নতা

সমাজভেদে সাম্যের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। গণতান্ত্রিক সমাজে সাম্যচেতনা খুব তীব্র হয়। কেননা গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করার ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যগুলোর চেতনাবোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাগ্রত হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রচার এবং অবাধ তথ্যপ্রবাহ সাম্যের চেতনাকে শাণিত করে এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ তৎপর হয়। অপরপক্ষে দাসসমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং রাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অধিকারবঞ্চিত মানুষ সাম্যের চেতনা লাভ করে না এবং অসাম্যকে প্রকৃতিগত মনে করে। সেসব সমাজে কেউ শাসনের জন্য, কেউ শাসিত হওয়ার জন্য, কেউ ভোগের জন্য এবং কেউ বঞ্চিত হওয়ার জন্য জন্মেছে এরূপ ধারণা চলতে থাকে।

আবার অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর সমাজে মানুষ কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে মুক্ত হয়। ফলে অসাম্য, বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে বস্তুনিষ্ঠ ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়া শিখে। অসাম্য ও শোষিত হওয়াকে ভাগ্যের পরিহাস হিসেবে মেনে নিতে চায় না। এগুলোকে তারা কৃত্রিম এবং মানবসৃষ্ট ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে মনে করে এর তিরোধানের জন্য সক্রিয় হয়। ফলে অগ্রসর ও শিক্ষিত সমাজে সাম্যচেতনা প্রখর হয় এবং অসাম্য তিরোধানের সংগ্রাম অবিরাম গতিতে চলতে থাকে। অন্যদিকে অনগ্রসর ও শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে থাকা সমাজে সাম্যের চেতনা সদাজাগ্রত নয়। অসাম্যের বিরুদ্ধে অসন্তোষ থাকলেও সামাজিক শক্তিগুলোর পরিপূর্ণ বিকাশ না হওয়াতে সংগঠিতভাবে অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয় না।

কৃষিভিত্তিক সমাজে মানুষ অনেকটা অদৃষ্টবাদী হয়। অসাম্যকে তারা স্বাভাবিক মনে করে। প্রকৃতি নির্ভর ফসলের উপর নির্ভরশীলতার কারণে অসাম্যের ব্যাপারে তাদের তেমন কোন অসন্তোষ থাকে না। কৃষিভিত্তিক সমাজ অনেকটা অসংগঠিত। ফলে স্বার্থ চেতনা বা গোষ্ঠী চেতনা সেখানে তেমন থাকে না। তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা শ্রমের ফলেই যে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি স্ফীত হয় এবং সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে সুখে জীবন যাপন করে সে ব্যাপারে তাদের তেমন মাথাব্যথা থাকে না। কিন্তু শিল্পভিত্তিক সমাজে শ্রমিকরা সচেতন এবং অত্যন্ত সংগঠিত। তারা মালিকশ্রেণির কাছাকাছি অবস্থান করে, মালিকদের বিলাস-বহুল জীবন নিকট থেকে দেখে। তার ফলে অসাম্যের চেতনা তাদের মধ্যে প্রবল হয়। তারা চাপ প্রয়োগ করে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রাম করে। তাদের পাওনা আদায় করার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাকে। ফলে সাম্যের চেতনা তীব্র হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, সমাজভেদে সাম্যের চেতনা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

১১.৪.৪ সাম্য ও গণতন্ত্র

সাম্য ও গণতন্ত্র পরস্পর নির্ভরশীল। সাম্য না থাকলে গণতন্ত্র অর্থহীন। কেননা গণতন্ত্র প্রত্যেকের মতের মূল্যায়ন করে। সাম্যের অনুপস্থিতিতে এটা সম্ভব নয়। যেখানে শ্রেণিভেদ প্রথা ও জাতিভেদ প্রথা রয়েছে, বংশ ও রক্তের আলাদা মর্যাদা রয়েছে সেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অচল। অর্থাৎ সামাজিক সাম্য গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত। সমাজবিজ্ঞানী উফ বলেন, "গণতান্ত্রিক সমাজ বলতে বুঝায় মুক্ত, সমান, সক্রিয় ও সচেতন নাগরিকের এক সমাজ।" এরূপ সমাজ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করতে পারে। তদ্রূপ যে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট সেখানে জীবিকার্জন নিয়ে মানুষ এত ব্যস্ত হবে যে, রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা করার সময় ও সুযোগ পাবে না। আবার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের সুযোগ থাকে বলে জনগণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুযোগ লাভ করে। তাই দেখা যায় গণতন্ত্র ও সাম্য পরস্পর নির্ভরশীল।

সার-সংক্ষেপ

সাম্য সমাজের জন্য অতীব প্রয়োজন। সাম্য অর্থ সমান নয় বরং সমান করার ব্যবস্থাকে সাম্য বলে। নানা ধরনের সাম্য বিদ্যমান। একটি সভ্য সামাজে সাম্যের উপস্থিতি একান্তভাবে অপরিহার্য। সাম্য ছাড়া স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব নয়। আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য পরস্পর নির্ভরশীল একে অপরের সম্পূরক। সমাজ ভেদে সাম্য চেতনা আলাদা হয়ে থাকে। তবে গণতন্ত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ সবচেয়ে বেশি। তাই গণতন্ত্র ও সাম্য পরস্পর নির্ভরশীল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সাম্য বলতে কি বুঝায় ?
ক. সকলে সমান
খ. সমান করার ব্যবস্থা
গ. সমান সুযোগসুবিধা
ঘ. সমান চোখে দেখা

২। সাম্য কত প্রকার ?
ক. তিন প্রকার
খ. চার প্রকার
গ. পাঁচ প্রকার
ঘ. ছয় প্রকার

৩। সমাজভেদে সাম্যের বিভিন্নতা ঘটে কেন ?
ক. পরিবর্তনের ফলে
খ. মূল্যবোধের পার্থক্য হেতু
গ. চেতনা পরিবর্তন হেতু
ঘ. আইনের প্রভাবে

৪। সাম্য ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক কেমন ?
ক. সম্পূরক
খ. বিরূপ
গ. চমৎকার
ঘ. নির্ভরশীল

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। আইনের সংজ্ঞা দিন। –১১.১.১
২। স্বাধীনতার অর্থ কি? –১১.২.৫
৩। সাম্য বলতে কি বোঝেন? –১১.৪.১
৪। আইনের বৈশিষ্ট্য কি কি? –১১.১.২
৫। আইন মান্য করার কারণ কি? –১১.২.১
৬। যথার্থ আইনের শাসন কাকে বলে? –১১.২.৩
৭। গণতন্ত্রের সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক কেমন? –১১.২.৯
৮। গণতন্ত্রের সাথে সাম্যের সম্পর্ক নির্ণয় করুন। –১১.৪.৪
৯। নাগরিক অধিকার ও প্রকৃত গণতন্ত্রের সম্পর্ক নির্ণয় করুন। –১১.২.৪

রচনামূলক উত্তরের প্রশ্ন

১০। আইনের উৎসগুলো আলোচনা করুন। –১১.১.৩
১১। আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক আলোচনা করুন। –১১.১.৫
১২। আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক আলোচনা করুন। –১১.১.৬
১৩। আইন কিরূপে সামাজিক পরিবর্তন সাধন করে তা বর্ণনা করুন। –১১.২.২
১৪। স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ বর্ণনা করুন। –১১.২.৬
১৫। স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলো আলোচনা করুন। –১১.২.৭
১৬। আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক আলোচনা করুন। –১১.২.৮
১৭। স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যাপারে নাগরিক ও সরকারের দায়িত্বশীলতা সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন। –১১.৩.১
১৮। সাম্য কি? সাম্যের বিভিন্ন রূপ আলোচনা করুন। –১১.৪.১ ও ১১.৪.২
১৯। সমাজভেদে সাম্যচেতনার ভিন্নতা আলোচনা করুন। –১১.৪.৩
২০। সাম্য কি? সাম্য ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক নির্ণয় করুন। –১১.৪.১ ও ১১.৪.৪

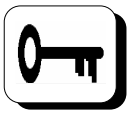

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। ঘ, ২। গ, ৩। খ, ৪। গ, ৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যাযন– ২ ঃ ১। গ, ২। গ, ৩। গ, ৪। ঘ, ৫। খ
পাঠোত্তর মূল্যালয়– ৩ ঃ ১। ঘ, ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪ ঃ ১। খ, ২। গ, ৩। খ, ৪। ঘ